প্রতিধ্বনি the Echo
A Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পে উত্তরবঙ্গের নিম্নবর্গীয় জনপদজীবন

মোহাঃ আমিরুল ইসলাম
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম, ভারত

Abstract

Abhijit sen is a famous and exceptional writer of 21st Century. As a Bank Officer he observed and surveyed the Uttarbangas' rural and marginalized people very closely. In North Bengal, Uttardinajpur, Dakhshindinajpur, Malda district and Murshidabad district he studied the poor, marginalized people and their socio-economical living. The districts of Darjeeling, jalpaiguri, and Coachbehare were also studied very closely. Basically Malda, Uttardinajpur, Dakhshindinajpur, and Malda district and their people, their religious faith, supernatural beliefs, socio-economical status, social life, etc . As a Bank Officer and loan Collector he got the opportunity to tread the unreached areas and saw the real plight of the people.

Abhijit sen is a new age writer in contemporary period. The new thoughts of literature like 'subaltern study', 'myth',' Magical realism' are present in his writings. The short stories of Abhijit Sen like—Dhanpoka, sheyal, Nadir madhey shahar, Simanta, Kalapata, Rahamater Feresta, Gandi, Lakhindar fire asbe, Kaak, mach, Mahabrukser aral etc. portray Uttarbangas' marginalized subaltern deprived classes' social life.

Abhijit Sen showed the life of Uttarbangas peoples in his own views, Their cultural life, religious life, social life, economical life, mystic realism, mythology and other facets are shown in his short stories.

অভিজিৎ সেনের জন্ম অবিভক্ত ভারতে ১৯৪৫ সালের ২৮ শে জানুয়ারি। জন্মস্থান পূর্ব বঙ্গের (অধূনা বাংলাদেশ) বরিশাল জেলার কেওড়া গ্রামে। অভিজিৎ সেন কলকাতায় আসেন গত শতকের পাঁচের দশকের একেবারে শুরুতে। কলকাতা, ঝাড়গ্রাম,পুরুলিয়া হয়ে ফের কলকাতা। এভাবে ঘুরে ঘুরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করেন তিনি। পড়াশোনার শেষ করার আগেই কলকাতার একটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি শুরু। ১৯৬৩-৬৯ এই ছয় বছর চাকরি করার পর, ঘর ও কলকাতা ত্যাগ করে সেই সময় তিনি , নক্সালপন্থী আন্দোলনে যোগ দেন। পরবর্তীতে রাজনীতি ত্যাগ করে উত্তর বাংলার বালুরঘাট শহরে বসবাস কালে ফের চাকরিতে যোগ দেন এবং সমবায় ও গ্রামীন ব্যাঙ্কে প্রায় ৩৪ বছর চাকরির সূত্রে উত্তরবঙ্গের **উত্তরদিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা,মুর্শির্দাবাদ** ইত্যাদি জেলায় ব্যাপক ঘোরা ফেরা করেন। এই ভাবে গ্রাম বাংলার সমাজ অর্থনীতির সঙ্গে গভীর পরিচয় হয় তাঁর। অভিজিৎ ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তিত বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার ২০০৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

অভিজিৎ সেনের ছোট গল্প ও সমকালীন সমাজ আলোচনায় আমরা প্রথমেই দেখব সত্তরের

দশকের নক্সালপন্থী আন্দোলনের কথা। যে আন্দোলনে অভিজিৎ সেন স্বয়ং প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ভাবে জড়িয়ে দিলেন। পরে অবশ্য ব্যক্তিগত চিন্তার প্রসার ও রাজনৈতিক সত্য উন্মোচনের ফলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। সত্তরের দশকের গ্রাম বাংলার সমকালীন সমাজ বলতে বিশেষ করে সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকেই ইঙ্গিত করা যায়। জমিদার ও চাষির সম্পর্ক, আধিয়ারা ও জমির মালিকে সম্পর্ক শ্রমিক মজুরদের মর্যাদা ইত্যাদির স্বরূপকেই বোঝানো হয়েছে।

সত্তরের দশকে সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় তথাকথিত নিম্নবর্গীয়দের শোষণ দেখা যায়। একজন কৃষক, চাষি,আধিয়ারকে ইচ্ছে মতো ব্যবহার করত জমির মালিক জমিদাররা। তারপরই আসে 'অপারেশন বর্গা'। আধিয়াররা চাষিরা নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়। নকশালপন্থী আন্দোলনে কৃষক-শ্রমিক-মজুর অর্থাৎ খেটে খাওয়া মানুষেরা তাদের অধিকারকে চিনতে সক্ষম হয়। অভিজিৎ সেনের ভাষায় -

" সত্তর - আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গের সমাজবিন্যাসে, রীতি-নীতিতে অধিকার সচেতনতায় বিশাল পরিবর্তন আসে।" [১]

অভিজিৎ সেন সমবায় ব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কে চাকরি সূত্রে প্রায় ৩৪ বছর উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে তিনটি জেলায় ও দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে দিয়াড়াঞ্চলে দিনের পর দিন, কখনো কখনো রাত কাটিয়েছেন। সেই সব লোকের শুধু বাড়ি নয়, হাড়ির খবর ও তিনি জানতেন। সেই সমস্ত মানুষের আচার অর্থনৈতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি। সরেজমিতে থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রত্যেকটা জিনিসকে তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন। আর তার এই উপলব্ধিরই পরিচয় পাই তাঁর বিভিন্ন ছোট গল্পে বিভিন্ন রচনার ঘটনার মধ্য দিয়ে।

বলা হয় 'সাহিত্যই সাহিত্যিকের জীবনবেদ'। অভিজিৎ সেনের গল্পে তাঁর জীবনানুভব, জীবন বীক্ষা এবং জীবন অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে এক বিশেষ দেশ-কাল পটভূমিতে। সেই বিশেষ দেশ-কাল-পটভূমিতেই তাঁর গল্পের পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি। আশৈশব সংগ্রাম বিশিষ্ট হয়ে ওঠার প্রবণতা, মানুষকে বোঝার চেষ্টা অভিজিৎকে ছোট থেকে করে তুলেছিল প্রকাশশীল। পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গবাস তাঁর জীবনানুভবকে বিস্তৃত করেছিল। সেই জীবনানুভব, অভিজ্ঞতা আর ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে সেই জীবনকথাকে। জীবন-সত্যের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়েই তাঁর সাহিত্যকর্ম দৃঢ় মাত্রা পেয়ে যায়। বলা যেতে পারে সত্তরের দশক থেকেই পরিণত গল্পকার অভিজিৎ সেনের পথ চলা শুরু। তাঁর সৃষ্টির ভৌগলিক জগৎ বিস্তৃত। সে জগতের বাসিন্দা হিসাবে তাঁর পরিচিত ঘনিষ্ঠ জগৎ ও বিস্ময়কর। ভৌগলিক ভাবে এ জগৎ প্রসারিত গঙ্গার উত্তরে, পূর্বে কোচবিহার পর্যন্ত, পশ্চিমে উত্তর-বিহার ও পূর্ব বিহার পর্যন্ত, গঙ্গা পেরিয়ে রাজমহলের পাহাড়ী সীমানায় বিস্তৃত। এ ভূমি অবশ্য গাঙ্গেয় ভূমি নয়, প্রাচীন বরেন্দ্রভূমি ও তার সংলগ্ন অঞ্চল। অভিজিৎ সেনের সাহিত্যে যে প্রকৃতি প্রধান ভাবে উপস্থিত তাঁর জগৎ একটাই। পুরনো পলিমাটির রুক্ষ জগৎ-তবু, প্রাচীন জনপদ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে আকীর্ণ , যার মধ্যে হারানো যুগের রাজাদের প্রাচীন গহন বিল, অন্যান্য অভিজ্ঞান।

জল আর মাটি - এটাই অভিজিৎ সেনের গল্পের প্রধান, প্রাকৃতিক উপাদান। গল্পের প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে আরও অনেক উপাদান - আকাশ - মেঘ - পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, রাত্রির নিকষ অন্ধকার - অবশ্যই উপস্থিত, কিন্তু কাহিনি যেহেতু মাটির আর জলের, আকাশ মেঘ জ্যোৎস্না অন্ধকার, আকাশের সঙ্গে মাটির সংযোগ মাটির প্রাণীরই প্রসঙ্গে তা শেষ পর্যন্ত বিষন্ন করুন। **"ধানপোকা" (১৯৭৬)** গল্পে তারই চিত্র পাই -

"নিস্তরঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে শুধু পোকার গুঞ্জ। মাঠের পর মাঠে পড়ে থাকা পাকা ধান। উত্তর থেকে দক্ষিণে মাইলের পর মাইল এই শস্য সমুদ্রের বিস্তার..... কত সব পোকা। অন্ধকারে দলে দলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে ধানের ছড়ার উপর। আবার কখনো বা দ্রুত ধাবমান ইঁদুরের ঘর্ ঘর্ খস্ খস্ শব্দ। .....আঘ্রানের দীর্ঘ রাত ইঁদুর আর পতঙ্গের কর্মচঞ্চলতায় তৎপর। মাঠের বুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে এই বিরাট কর্মকান্ডের স্বরূপ টের পাওয়া যায়।

ধান ক্ষেত্রের বিশ পঁচিশ হাত উপরে ঘন কুয়াশার একটা আস্তরন ঝুলে আছে। আকাশ

সামান্য উদ্ভাসিত হয়েছে কিন্তু কুয়াশার নুর, পুরোপুরি দৃশ্যমান নয়। শুধু শরীর দিয়ে কুয়াশার এই নদীকে উপলব্ধী করতে পা ছে তারা মনি আর তার বাপ সুপিন।"[২]

দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ শস্য আকাশ-কুয়াশা-দুটি মানুষকে নিয়ে নির্জন নিশায় সক্রীয় জীবজগৎ (আসলে দুটি মানুষও তো ধানপোকা) মাটির মাঠকেই জাগ্রত করে রেখেছে এই ভরা আঘ্রাণের রাতে। জল আর মাটি। জলের উৎস নদী, কিন্তু সে নদী গঙ্গা,পদ্মা এমনকি মহানন্দা, তিস্তা বা তোর্সার মতো পরিচিত নাম নয়; অপরিচিত বিচিত্র নামের, অথচ গল্পের মানুষ জনের প্রতিদিনের জীবন-ধমনীর মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী। বিচিত্র সব নাম ঃ **সাগর,চিরি ব্রাক্ষণী টাঙন, পাতালু ডিমা, মহানন্দা, কালিন্দ্রী, ফুলহর, পাগলা, পুণর্ভাবা, ভাগীরথী** আরো কত। উত্তরবঙ্গের নদীপথ বেশি মাত্রায় পবির্তনশীল কখনও খাত পরিত্যক্ত, নদী সরে যায়; কখনও নদীতে জাগে নতুন ডাঙা, ভরা বন্যায় বেগবতী নদীর কিনারে চাল থেকে জল ঝরা দাওয়া - সবই এই নদী মাতৃক ভূখন্ডের খন্ড খন্ড অংশ। নদীকে বাদ দিয়ে কাহিণীগুলির কথা ভাবা যায় না, মাটিকে বাদ দিয়েও নয়। বরেন্দ্রভূমির মাটিকে বশ করতে হয় কঠিন পরিশ্রমে, রুক্ষ প্রান্তর আবাদের প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়ে ওঠে মাত্র।

প্রাচীন কঠিন পলিমাটির এই ভূখন্ডে 'ল্যাটেরাইট মৃত্তির দু-একটা পকেট ' দেখা যায়, তার মধ্যে অনেক দূরে সরে যাওয়া নদীর ফেলে যাওয়া খাত, 'ফলে নদীর তীরবর্তী ভূভাগে নতুন পলির ধূসর আস্তর' বিছিয়ে যায়।

এই বিস্তৃত সহজে অসমনীয় ভৌগলিক জগতের মধ্যেই অভিজিৎ সেনের গল্পের মানুষ মানু ষীর জগৎ। সে মানুষ ব্যক্তি মানুষ অথবা গোষ্ঠীবদ্ধ, মানুষ। একটু খেয়াল করে পড়লে মনে হয় গল্পের এবং উপন্যাসেরও ব্যক্তি মানুষ ঠিক ব্যক্তি-মানুষ নয় সচেতন ভাবে না হলেও গোষ্ঠীর মধ্যেই সে উপস্থিত। তাই বিরল ক্ষেত্রে কাহিণী যখন প্রেমের, তখন নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক শুধু পারস্পরিকতার মধ্যে একান্ত, ঘনিষ্ঠ না থেকে বৃহত্তর জগতের দোলায় দোলে, দ্বিধা বা সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত টানাপোড়েনের বিষয় নয়, সমাজ সেখানে তার বিশাল ছায়া নিয়ে উপস্থিত।

অভিজিৎ সেনের মানুষ - মানুষী , সাধারণত যাদের নিম্নবর্গীয় বলা হয় তারা। তাঁর গল্পে অপেক্ষাকৃত গৌণ ভাবে হলেও মধ্যবিত্ত বাঙালি উপস্থিত, সে বাঙালির সামাজিক অবস্থানও এক নয়। ভূমি কেন্দ্রিক সম্প্রদায় ঃ জমির মালিক, উৎপাদন, ও নতুন কৃষি ভূমি পত্তনে উদ্যোগী যারা, তারাও বিভিন্ন জাতে বিভক্ত হতে পারে। সম্পদ সামর্থ্যে নমঃশূদ্র সদ্‌গোপ বা 'উঁচু' জাত হিসাবে গণ্য কৃষিজীবিদের মধ্যবিত্ত হতে বাধা নেয় ; এদের গোষ্ঠীবদ্ধতা ব্যাপক অর্থে সামাজিক শক্তির উৎস। গল্পের বিচিত্র চরিত্র মিছিলে শিক্ষিত, শহুরে মধ্যবিত্ত (অনেকেই আর্থিক মাপকাঠিতে নিম্নবিত্ত) বাঙালি অবশ্যই উপস্থিত; যদিও এখানে তাঁরাই প্রধানত প্রান্তিক । যাঁদের উপস্থিতি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্যে সূচক, তাঁরা প্রধানত স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা কিংবা জমির মালিক। কিন্তু গল্পের শিক্ষিত কিছুটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজ-সচেতন মধ্যবিত্ত চরিত্র বহিরাগত যে কোনো আকস্মিক পরিস্থিতিতে বা সংকটে তারা দ্বিধাগ্রস্থ সংশয়ী দৃঢ় নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দোলাচল। কলকাতা থেকে স্থানীয় শহুরে জগতে আসা এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে আছেন শিক্ষক - শিক্ষিকা, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, সমব্যয় কর্মসূচীর কর্মী এঁদের সামাজিক পটভূমি মোটামুটি একই ধরনের হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমধর্মী নাও হতে পারেন। যে সমতল ভূমিতে সকলে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে তার মধ্যে দেখা যায় বেধে ও কর্মে অনিশ্চয়তা , কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ববিরোধীতা। স্থানীয় শহরে মধ্যবিত্ত গৃহী বাল্যবন্ধু - একদা সম্পন্ন পরিবারের বহিস্কৃত সন্তানকে অস্তিত্বের বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার বিভিন্ন স্তরে দূর দর্শক সাক্ষী হয়ে থাকবে। দেখে, চরম অবমাননায় ধাঙড় বস্তি থেকে বিতাড়িত একদা - মানী তার বন্ধু বিনয় - অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী বিনয় - ডুবে - মরা অপঘাত মৃত্যুকেও শেষ পর্যন্ত ধাশড় বস্তির বেমানান বাসিন্দা হয়েই থাকে ঃ

"শ্মশান দশফুট জলের তলায়। নিকটতর উঁচু জলহীন স্থান, বলতে বড় রাস্তার জেগে থাকা একটা অংশ। সেখানেই চিতা সাজাল মেথররা। আমি , প্রনয় ইত্যাদিরা দূর দাঁড়িয়ে দাহ দেখলাম, মর্গে মৃতদেহ দারি করার সাহস পর্যন্ত আমরা করিনি। পাথরের মত মুখ করে মেথররা তাদের

রীতি অনুযায়ী বিনয়ের শবদাহ করল। সব শেষ হতে শ্মশানযাত্রী চোদ্দজন মেথর মাথা কামিয়ে তাদের স্বজনকৃত্য শেষ করে ট্রাক্টর চালিয়ে চলে গেল।"[৩]

'ব্রাহ্মণ্য' (১৯৯১) গল্পেও শহুরে, শিক্ষিত প্রত্যয়মুখি হয়েছে ধানচাষি, পানচাষি, সম্পন্ন পরিবারের সংস্কার - মানা বিশ্বাসের আচরণের। 'ব্রাহ্মণ্য' বর্জনকারি নাগরিক নচিকেতা কি সত্যিই ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের উর্দ্ধে? যখন পারে তার ভালবেসে বিয়ে করা স্ত্রীর কুলীন কায়স্থ পরিচয় মেকি, তখনই সে সচেতন হয় নিজেদের মধ্যের সাংস্কৃতিক ব্যবধান নিয়ে, উদবিগ্ন হয়ে পড়ে দূরে ভ্রান্ত পরিচয়ের মাতুলালয়ে বড় হতে থাকা পুত্রের ভবিষ্যত চিন্তায়।

আর এক গল্পে, অনুশীলা কলকাতা থেকে চারশো, সাড়ে-চারশো মাইল দূরে নির্বাসিত, মাতৃত্বের বুভুক্ষ এক মহিলা। বেদেদের এক অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত শিশুকে সে গ্রহণ করতে পারে না। যাযাবর এই বেদে গোষ্ঠীর কিশোরী মাতা যখন সাপ ধরতে গিয়ে সাপের ছোবল খেয়ে মরে , আর তার পরিত্যক্ত 'মা-খাওয়া চ্যাংড়া' যখন তার স্বরে বাক্‌হীন ভাষায় তার আশ্রয়হীনতা ঘোষণা করতে থাকে, তখন কিন্তু অধস্তন কর্মচারীর মৃতবৎসা,একই ধরনের মাতৃত্বলোভী, পরিচারিকা স্ত্রী মাল তার পরিচিত পৃথিবীর উদ্দেশ্যে নির্দ্বিধায় ঘোষণা করে ঃ

"বেবাক মাইনষে শুইনে রাখেনই। বাইদার চ্যাংড়া আইজ থেকে মোর হইল হয় । বাবা রঘুনাথ মোর কোলৎ এ চ্যাংড়াক পাঠাইলেন হয়।"[৪]

কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে পূর্নলব্ধ মাতৃত্বের স্নেহে আহবান জানায় ঃ'চলরে বেটোয়া, ঘরেৎ চল'(বখিলা)

'স্কিংক্স' - (১৯৯৩) গল্পের আপাত দুবোধ নির্বাক নারী, তার অবরুদ্ধ যৌনতাড়না, উদগ্র সন্ত ান কামনার সঙ্গে মিলিত হয়ে নির্বাসিত , শহরে শিক্ষিত ও সংস্কৃত সমবায় কর্মীকে প্লাবিত করে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আত্মরক্ষা করে; শক্তির শেষ বিন্দু ব্যয় করে এই আত্মরক্ষার আতি ধাবিতা ছিল তার ক্রমক্ষীয়মান আত্মসত্তার প্রতি ; এক অসহায় প্রশ্নের আকার নেওয়া সে আর্তি।

অভিজিৎ সেনের গল্পে অবশ্য এই মানুষই খানিকটা প্রান্তিক হলেও তারা প্রধান চরিত্র নয়, তারা এসেছে এই ভূখন্ডের বাসিন্দা হিসেবে, কেউ স্থায়ী, কেউ অস্থায়ী। তাঁর গল্পের কেন্দ্রস্থলে যে মানবগোষ্ঠী বা ব্যক্তিমানুষ আছে, তারা বিভিন্ন এবং বিচিত্র সম্প্রদায়ের ঃ তার মধ্যে আছে কল্পলোকের আদি পুরুষ আর তার সজীব স্মৃতি নিয়ে যাযাবর বাজিকর ; আছে **সাঁওতাল, ওরাঁও, ডুয়ার্সের অরণ্য পটভূমিতে রাঙা, কোচ, রাজবংশী, টোট্টো, হিন্দু সমাজের জাতিস্তর বিন্যস্ত নানা জাতি-প্রজাতিতে; আছে মুসলমান সম্প্রদায় - উত্তরবঙ্গে যাদের বাস, বাসের স্মৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য প্রায় হাজার বছরের পুরনো**। কাহিনী, কখনো, সীমান্ত নিয়ে যার বাসিন্দা 'বদলি জোয়ান সীমান্ত পেরিয়েও কাহিনি বাংলাদেশের নাগরিকের আধুনিকতম জীবনের জটিলতা নিয়ে। স্বাধীনতা উত্তর - পুরনো আর নতুন প্রজন্মের মানব - মানবী নিয়ে যে সমাজ, সেই জীবন্ত এবং সেই জগতের নির্মম বাস্তবতা নিয়ে কাহিনীর জগৎ। এই মানব - মানবীরা প্রায়শই, সম্প্রদায়বদ্ধ, কিন্তু প্রান্তিক, নিম্নবর্গীয় মানেই অভিন্ন নয়। প্রত্যেক স্বতন্ত্র সপ্রদায়ই আবার নানা স্তরে বিভক্ত ঃ ক্ষমতা, আর্থিক সঙ্গতি, সামাজিক দূরত্ব বিস্তর। যেখানে সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য, তার নিজস্ব সম্মান সম্প্রদায়ের অসম স্তরগুলিকেও সংবদ্ধ করে, নানা সামাজিক সংঘাতে, রক্তক্ষয়ী হিংস্রতায় সে স্বাতন্ত্র্য মহিমা ঘোষিত হয়। এ সমাজ ও দ্রুত পদচারনায় পরিবর্তমান। স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গদেশে তথা বাংলাদেশে অভুত্থানোত্তর সামাজিক পরিবর্তন, রাজনৈতিক আবর্তন, এবং ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিময়তা নতুন মাত্রা এনে উপস্থিত করেছে। কিন্তু সাহিত্য সামাজিক বা রাজনৈতিক বিবরণ বা বিশ্লেষণ নয়। ইতিহাসের ঘূর্নাবর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে যারা, তারা সাধারণ মানব-মানবী; সমাজ, রাজনীতি তাদেরই দর্পনে ধরা। **'বহু চন্ডালের হাড়' (১৯৮৫)** উপন্যাসে ইতিহাসে যেখানে শুরু হয়, উপন্যাসেও বাজিকর গোষ্ঠী সেই পর্বে এক আদিভূমির ধূসর স্মৃতি আর কল্পকাহিনির মতো অভিশাপ বয়ে বেড়নো এবং সংহত গোষ্ঠী; সাঁওতাল বিদ্রোহ, আর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও পীড়ন উত্তীর্ণ হয়ে আসার মধ্যে ইতিহাসের অনেক পাতা উল্টে যায়। যে গোষ্ঠী

পরিচয়হীন, ক্ষুধার অন্নে গোমাংস আর শূকর মাংসে যাদের ভিন্নভেদ নেই; জাতিহীন প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে ধর্মহীন, তারা আজ ধর্মে দীক্ষিত হবার সামাজিক চাপের মুখোমুখি হয়, এক গোষ্ঠী হয় বহুধঅ বিভক্ত। নতুন প্রজন্মের যুবক শারিক - শহরবাসী, বিবেকবান শারিক যে কথা দিয়েও তার বন্ধুকে স্থানীয় নমঃশূদ্রদের হিংসার হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি - এই পরিবর্তনের কথা নিয়ে গভীর ভাবে -

"মুসলমানি ও হিন্দুয়ানিতে বিভক্ত বাজিকরেরা বহুকে বিস্মৃত হয়ে গেছে, একথা এবার সে গভীরভাবে ভেবেছে। হতাশার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে আর বহু চন্ডালের হাড় খুঁজবে না, একথা বোঝে শারিক। অনেক চিন্তা করেও সে বুঝতে পারে না, এতে বাজিকরের ভালো হল, কি খারাপ হল।"[৫]

'বর্গক্ষেত্র' গল্পে মৌজা দক্ষিণ কাশিয়ানির আধিয়ারি চাষি আস্তিকমাল। ছেলেও ভাই নিয়ে জমির মালিক শচিকান্ত রায়ের জমিতে চাষ করে চার পুরুষ ধরে। শচীকান্ত রায় ঘোর বৈষ্ণব, প্রতিবৎসর গুরুর আগমন উপলক্ষে দীয়তাং ভভুজতাং মহোৎসব হয়, শচীকান্তের দাক্ষিণ্যে আস্তিক মাল দীক্ষা নিয়ে শচীকান্তের গুরুভাই বলে গণ্য হয়। সরকারী উদ্যোগে ও বন্দ্যোবস্তে 'আধিয়ারি' জমির যখন আধি-স্বত্ব নথিভুক্ত হওয়া শুরু হয়, ভাই ও ছেলের উদ্বেগ সত্ত্বেও আস্তিক কিন্তু বিশ্বাসী; তাই 'যেখানে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিপ্রস্তর চারপুরুষ ধরে তৈরী হয়েছে, সেখানে কাগজপত্র অবান্তর তার কাজে।' বিশ্বাস কিন্তু পারস্পরিক নয়, পরম বৈষ্ণব গুরুভাই বিশ্বাস ভঙ্গ করে আখি জমির অধিকাংশ বেচে দেয়। বিশ্বাস ভঙ্গের খবর , যখন আসে, সে খবরের ফল হয় মর্মান্তিক, উপস্থিত সকলেই, এক অতিপ্রাকৃত দৃশ্য দেখে , যে রকম দৃশ্য জীবনে এক - আধাবরই অভিজ্ঞতায় আসে।

" ঋজু আস্তিকের দন্ডায়মান দেহকান্ড সম্পূর্ণ স্থবির ও সমাধিপ্রাপ্ত। তার দৃষ্টি নিস্পলক এবং এত নির্মম রকমের অঞ্চল যে তার দ্বারা হতাশা, ক্ষোভ , বেদনা , বিস্ময় - যা কিনা তারাপদ প্রাণপনে দেখতে চাইছিল, কিছুই ফুটে ওঠে না। কয়েকমুহূর্ত যেন মহাকাল থমকে থেকে থাকে সেই বিশাল দেহটির মধ্যে। তারাপদর আর্তনাদ এবং স্পর্শ এই জীবন্ত ফিজটির ছেদ ঘটায়। আস্তিক বনস্পতির মতো মাটিতে পড়ে। আস্তিক মাল নামক এক প্রাচীন দৈত্যের এই ভাবে কালান্তর হয়।"[৬]

কাহিনির শেষ এখানেই নয়, কিন্তু বিশ্বাসের মতো, দেব-স্বিজ-গুরুঠাকুরের প্রশ্নহীন ভক্তির মতো পুরনো কালের মূল্যবোধ তো নিম্নবর্গের সমাজে থাকবে, উচ্চবর্গে তার পারস্পরিকতা উপস্থিত থাকুক না থাকুক।

'ঋষির শ্রাদ্ধ' গল্পে ভীমঋষির গল্প তাই তার একার গল্প নয়, আমাদের প্রত্যেকেরই গল্প হয়ে দাঁড়ায়। ভীমঋষির সংলাপও তাই হয়ে ওঠে তাৎপর্যপূর্ণ। দরিদ্র ঋষিদাসদের গোষ্ঠীপতি ভীম বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারক। ভীম তার হাটখোলার কারখানায় খোল, মাদল, ঢোল, ঢোলক ইত্যাদি নানান বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করে। 'আমি' মালীহার ব্যাঙ্ক শাখার ম্যানেজার । রিজিওন্যাল ম্যানেজার সুরঞ্জন সেন দেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও এবং এই সীমিত ব্যবস্থাতেও উন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী। দরিদ্র ভীমগোষ্ঠী তথা ঋষিপল্লীর উন্নতিকল্পে একটি প্রকল্প তৈরি করলেন ম্যানেজার 'আমি'। সুরঞ্জন সেন সেই প্রকল্পের সঙ্গে হাউস ডেয়ারি প্রকল্প যুক্ত করলেন। প্রকল্পের টাকা বাস্তবায়িত হওয়ার আগে এবং পরে ভীম ঋষি একই বক্তব্য বারবার বলে: "না স্যার ও কাজ আমাদের নয়, ও ঘোষেদের কাজ। ও আমরা পারব না।" তবুও ঋষিপলীর ছয়জন হাউস ডেয়ারি এবং চামড়ার কাজের জন্য টাকা নিল, বাকি চারজন নিল শুধু চামড়ার কাজের জন্য। কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই হাউসডেয়ারিপ্রকল্প সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল, আর চামড়ার প্রকল্পও বৈষ্ণব গোষ্ঠীর সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে লোকসানের কবলে পড়ল। ভীমঋষির অভিমান যে যাদের যা কাজ নয়, তারা আজ সেই কাজ করছে। ভীমের বিষন্ন সংলাপ : "তখনই আপনাকে বলেছিলাম গাইপোষা ঋষিদের কাজ নয়। আপনি শুনলেন না। দু মাসে হাপশে গেল সবাই।" কিংবা তার প্রতিক্রিয়া : "দাদা পর দাদা- তার দাদার আমল থেকে ভীমেরা রামকেলিতে ঢোল মৃদঙ্গ বেচছে। এরকম কান্ড কোনদিন হয়নি।" সুতরাং আপাত গল্পের মধ্যে আমাদের মধ্যবিত্তের পরজীবি অস্তিত্বের নিস্ফলত্ব প্রমাণিত

হয়ে যায়। তাই ম্যানেজার 'আমি' কোন অর্থেই ব্যাঙ্কের লোক না হওয়া সত্ত্বেও এবং সুরঞ্জন সেনের সঙ্গে সকল মানুষের উন্নয়ণ প্রকল্পের সহকারী হওয়া সত্ত্বেও শহরে এসে মালীহার গ্রামের কথা ভুলে যান। তথাপি যেহেতু 'আমি' ভিন্ন ভাবনার অংশীদার আর সেই ভাবনা লেখকেরই ভাবনা আর তা আমাদের মাটি বাতাসে পশ্চিমী উন্নয়ণের ফলবান না হওয়ার দিকটিকে তথা আমাদের সমাজের বন্ধ্যা ও হতশ্রী দশাটিকেই চিহ্নিত করে।

'নদীর মধ্যে শহর' গল্পটিও ভীমঋষির গল্পের মতোই 'আমি'-র অনুরূপে অভিজ্ঞানের কাহিনি। ঔপনিবেশিক আধুনিকতা যে সম্পূর্ণ নয়, তা যে কেবলই ফলদায়ক হয়েছে সমাজের আধুনিক মানুষদের ক্ষেত্রে তা উপলব্ধি করা যায় এই গল্প পাঠের দ্বারা। অভিজিৎ সেন কেবল গল্প বলতে বসেন নি, গল্প শেষে আমাদের বায়বীয় অস্তিত্বের কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্যতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও দেন। তাই গল্প শেষে 'আমি'র বক্তব্য আর লেখকের অভিজ্ঞতা সমীকৃত হয়ে যায়। লেখকের জিজ্ঞাসায় পাঠকও উত্তর খোঁজে অবলম্বনহীন বাস্তবতার অংশীদার হয়েই। গল্পের 'আমি' এবং বিনয় একদা সহপাঠী। তাদের উভয়ের আরো সাদৃশ্য হল যে তারা উচ্চবর্ণের মাহিষ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিনয়ের পিতামহ গোলাক মজুমদার তিরিশ এবং চল্লিশের দশকের জাতীয়তাবাদী আদর্শকে সামনে রেখে বহু দানধ্যানের অংশিদার হয়েছিলেন, তাঁর এলাকায় হাসপাতালের জন্য তিনি জমিও দান করেছিলেন। পৌত্র বিনয়কে শান্তিনিকেতনেও পাঠিয়েছিলেন শিক্ষালাভের জন্য। গোলোক মাজুমদারের দৌলতে বিনয়ের পিতা মন্মথ মজুমদার এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন এবং সুরা ও নারী বিলাসে জীবন অতিবাহিত করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে বিনয়ের পিতা এবং পিতামহের যুগপৎ প্রভাবই কার্যকর। বর্তমানে গল্পের 'আমি' জয়দেব এবং বিনয় দুই ভিন্নপ্রান্তের বাসিন্দা। সরকারি বাস্তুকারের অফিসে প্রচুর টাকা পয়সা রোজগার ক'রে শহরতলীর মধ্যে পাকাবাড়ি, আসবাব ও বিলাস সামগ্রীর মালিক। অন্য দিকে বিনয় মেথর পাড়ার মহারাণী বাঁশফোড়ের প্রেমিক হিসাবে স্বজন সমাজচ্যুত হয়ে ঝাড়ুদারদের ভাঙাচোরা কোয়ার্টারে বসবাসকারী একজন। বিনয়ের ভাই প্রণয় পড়েছে ডাক্তারি। এই হল এ গল্পের আপাত পাঠ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ গল্পের অন্তর্ভেদে যে ভিন্ন পাঠ উঠে আসে তাতে দেখা যায় আমাদের অস্তিত্বের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন সত্যটিকে। তাই 'আমি' আর বিনয় শুধু সমাজে প্রতিষ্ঠিত আর অন্তেবাসী থেকে যায় যা তাদের শিরায় শিরায় সেই বিচ্ছিন্নতার রক্ত প্রবাহিত হতেও দেখা যায়। তাই উচ্চবর্ণের মাহিষ্য সম্প্রদায়ের 'আমি'র মনে হয় পিতা মন্মথ মজুমদারের মতো বিনয় মেথরের মেয়েটিকে স্ত্রী হিসাবে মেনে না নিয়ে রক্ষিতা রাখলেও তার বংশগৌরব কিছু পরিমাণে রক্ষিত হত। অন্যদিকে বিনয়ের উপলব্ধি : **তোমরা আমাকে অনেক আগেই ত্যাগ করেছ। আমি মেথর। আমি মল ভান্ডের পাশে বসে খেতে পারি। নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারি কুকুরকে জড়িয়ে ধরে। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করতে পারি! আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে অন্যপুরুষের সঙ্গে চলে যেতে পারে! তোমাদের এটা শুধু পুরুষরাই পারে, যেমন আমার বাপ করেছিল। কিন্তু আমি তাকে ধরে এনে মেরে রক্তাক্ত করতে পারি এবং তার পরে মদ খেয়ে দুজনে হল্লা করতে পারি। এই সমস্ত কিছুরপরে দুজনে উন্মাদের মত যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতে পারি!** তাই 'আমি'কে উচ্চবর্ণের মাহিষ্য বর্তমানে মেথর পল্লীর বিনয়ের প্রশ্ন, একদা সহপাঠী বিনয়ের প্রশ্ন যে, কে কদর্য জীবন অতিবাহিত করছে? যে ব্যক্তি উচ্চবর্ণের সন্তান হয়ে মেথর নারীর আকর্ষণে সকলের ঘৃণার পাত্র হয়, শিক্ষিত ও যোগ্য হয়েও চাকরি না পেয়ে দারিদ্রের কবলে পড়ে মেথরের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার নামে বিশ পঁচিশ টাকা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করছে সে; না কি কৌশলে উপরিপাওনার অর্থ রোজগারের দ্বারা বাড়ি ও সম্পত্তি করেছে সে? কিন্তু বিনয়ও কি মেথর হতে পেরেছিল, বিনয়ের পক্ষে কি তা হওয়া সম্ভব? এ গল্পের তাই দুই অংশ। প্রথম অংশে অভিজিৎ দেশজ উচ্চবর্ণের চেতনায় নিম্নবর্গের মানুষজন সম্পর্কে ধারনার স্বরূপকে প্রাক্ উপনিবেশপর্বে সমাজে বিভাজন দৃষ্ট ছিল, কিন্তু উপনিবেশ পর্বের আধুনিকতাও উচ্চবর্গের চেতনায় নিম্নবর্গকে নিজের করে নিতে পারেনি। দ্বিতীয় অংশে তিনি রূপায়িত করেন উচ্চবর্গের মানুষটির গর্বিত ঘোষণা - "আমি

মেথর" বাস্তবে কেমন মিথ্যা হয়ে যায়। উচ্চবর্গের মানুষটির ভালবাসাও গোষ্ঠীতে ঠাঁই দেয় না। যে বিনয়কে একদা স্বজন সমাজ ত্যাগ করতে হয়েছিল, সেই বিনয় মহারানীর সঙ্গে দরিদ্রতর ঝিপাড়াতেও একঘরে থেকে যায়। উপরন্তু পরবর্তীতে বিনয়কে মহারাণীর হসপিটাল থেকেও চ্যুত হতে হয়। তাই বিনয়ের মৃত্যুর পরে যদিও মেথররাই শেষকৃত্য করে, 'আমি' এবং ডাক্তার ভাই প্রণয় প্রত্যক্ষদর্শী থেকেই যায়, কিন্তু পূর্ববর্তী মুহূর্ত পর্যন্ত তার নিরালম্ব অস্তিত্বের মধ্যে আমাদের অষ্টাবক্র সমাজের প্রতিচ্ছবিকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই গল্পের নামকরণ 'নদীর মধ্যে শহর' তাই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'নদীর মধ্যে শহর' এই আমরা কি বাস করছি না? যার উঁচু দালানের উপর থেকে নিম্নের জলের স্রোতকে প্রত্যক্ষ করে কেউ, অন্যদিকে উঁচু ডাঙ্গার ঝুপড়ির মধ্যে থেকে কেউ হৈ-হল্লাতে মেতে ওঠে। কিন্তু জলের চোরাস্রোতে ভেসে যায় বিনয়ের মতো কেউ কেউ, যাদের ঠাঁই হয় না ঝোপড়িতে বা দরদালানে। এই উচ্চারণ তাই প্রতীকি হয়ে ওঠে : "বিনয় যদি ব্রিজ পার হয়ে ওপারে যেন, তাহলে সে বেশি ভূখন্ড পেত। ও পাশটা জলে তেমন ডোবে নি; কিন্তু সে তা করল না । সে আরেকবার হতাশ ভাবে তার স্বজনদের দিকে তাকিয়ে এ পারের জলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগল।"

এর পাশাপাশি **'শিশুপাল'**-এর মতো গল্প পাঠ করলে সমাজের নানা স্তরের শাসন শোষণের চিত্রকে প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ করা যায়। আশি - নব্বইয়ের দশকে অপারেশন মাধ্যমে এবং গ্রামীণ সমাজে নানা উন্নয়ন প্রকল্প সংযুক্ত হওয়ার ফলে প্রতিকায়িত কৃষকদের নিজস্ব দাবি স্বীকৃত হল। কিন্তু আপাত উন্নয়নের মধ্যে ও নানা ক্ষমতা ও দাপটের টানাপোড়ে থেকেই যায়, সময় বদলালেও তাই অবস্থার বিশেষ বদল হয় না ভূমি নির্ভর কৃষকদের নানান সমস্যা - তাদের শোষণের বহুমাত্রিক চিত্র জমির হাতবদলের কাহিনি, রাজনৈতিক কর্মীর আদর্শহীনতা ও ভন্ডামি অভিজিতের রচনায় বার বার উঠে এসেছে। উত্তরবঙ্গের গ্রাম বাংলার সঙ্গে পরিচিত লেখক অধিকাংশক্ষেত্রে ব্যাংককর্মী চারিত্রের মধ্য দিয়ে বর্তমান ব্যবস্থায় নানা সুফল ও কুফলকে উপস্থাপিত করেন। তাঁর এই সমস্ত গল্প আমাদের বর্তমান লহমার প্রতিটি স্পন্দন আমাদের অন্ত লোকে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। তাঁর গল্পের কুশীলবরা কেবল ব্যক্তিচরিত্রের অংশীদার একরৈখিক বক্তব্যের ধারক হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকে না, তারা হয়ে ওঠে বিশেষ কাল ও প্রজন্মের প্রতীক। 'শিশুপাল' গল্পের ঢিলা মন্ডল ইতিহাসের বাহন হয়ে ওঠে। সে আজ বেদনায় দীর্ঘ নিঃশ্বাসকে সম্বল ক'রে বেঁচে রয়েছে। তার সেই পরিণতির অন্তরালটিকে চিনে নেওয়া যায়, দেখা যায় তার নেপথ্যে রয়েছে সমাজের বহু স্তরের শোষণ, চাতুর্য, ক্ষমতা,দাপট, আধিপত্যের অবয়বকে। গল্পের প্রারম্ভেই নিবন্ধকারের মতো অভিজিৎ দেউনিয়া শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করেন। ঢিলা একসময় গ্রামের এবং থানার সেই রকমই একজন দেউনিয়া ছিল। তখন ঢিলার কাছে কেবলমাত্র সৎ মানুষরাই আসত। কিন্তু সে দিনের অবসান ঘটেছে। বর্তমানে দেউনিয়া শব্দের অর্থের রূপান্তর ঘটেছে। বর্তমানে দেউনিয়া ক্ষমতাশালী দানী সিংহরায় স্বার্থশূন্য সামাজিক দায়িত্ব পালন করে না, তার কাছে সৎ-অসৎ নানা ধরনের মানুষ ভিড় করে। ঢিলা মন্ডল একদা রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে শরিক ছিলেন, তেভাগার সময় থেকে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে একত্রে সংগ্রাম করেছে। অর্থাৎ গল্পের প্রারম্ভেই প্রাক্তন ও বর্তমান দেউনিয়ার স্বরূপ, ঢিলা মন্ডল ও দানী সিংহ রায়ের মনোভঙ্গিগত বৈসাদৃশ্য তথা সমাজ অর্থনীতিগত বৈষম্যকে উপস্থাপিত করেন। অভিজিতের গল্পের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেবল ব্যক্তিরত গল্প থাকে না, লেখকের বীক্ষায় যে সময় উঠে আসে, তাই পাঠকের চোখে তার বর্তমানের প্রেক্ষিতে পরীক্ষিত সত্য হয়েই ধরা পড়ে। অভিজিৎ ছোটগল্পের গতানু গতিক সীমারেখাও মেনে চলেন না। জীবনের অর্থবহ পরিস্থিতিকে, সুতীক্ষ্ণ সুতীব্র মুহূর্তগুলিকে ইঙ্গিতে নিহিতার্থে উন্মোচনেই তাঁর লক্ষ্য সীমাবদ্ধ থাকে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লেখক মন্থরলয়ে ঘটনার বিস্তারের মধ্য দিয়ে সময়ের বিবর্তন রেখাটিকে স্পষ্ট ক'রে তোলেন। ন্যারেশনের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের দেশজ গল্প বলার ধরন অর্থাৎ কথকতা ধর্মিতাকেই প্রাধান্য দেন এবং সেই কথকতাতেও একধরনের আপাত কৌতুক বজায় রেখেছেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে দানী সিংহরায়ের মতো মানুষজনের

ক্রিয়াকলাপ এবং উত্তরোত্তর বেড়ে ওঠা - ঢিলাকে বিষন্ন ক'রে তোলে। কিন্তু লেখকের কথনে আপাত কৌতুক ঃ

"ষাটের দশকের শুরু থেকেই ঢিলা মন্ডলের অনেক কিছু আলুনি লাগতে শুরু করে, কেমন যেন সবকিছুতে নুন কম লাগতে থাকে। কি মুখের খাবারে, কি মুখের কথায়। সমাজে কিম্বা রাজনীতিতে, সবজায়গাতেই নুনের বড় অভাব। শেষে ঢিলা ভেবে ছিল নুনের পরিমান হয়ত ঠিক আছে, কমে গেছে নুনের ধক। সে জন্যই এমন লাগে। তাই সে আস্তে আস্তে সরে আসে।"[৭]

প্রথাগত শিক্ষার স্পর্শহীন অথচ বাস্তব সমাজ সম্পর্কে গভীরভাবে অভিজ্ঞ মানুষটির অনুভূতির কথা সমসময়ের অংশীদার মানুষকে শাণিত জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। গ্রামের মানুষের ভূমি ও তার সংস্কার জনিত টানাপোড়ন, জমির উচ্ছেদ ও জমির দখল সংক্রান্ত নানাজটিলতার বৃত্তান্ত অভিজিৎ শিক্ষিত শহরবাসী পাঠকের কাছে হাজির করেন। আইন ব্যবস্থার নানা ধারা উপধারার প্রসঙ্গ, মালিক মহাজন উকিল মোক্তারের সহস্র ছিদ্র বের করার প্রচেষ্টার দিক, যা ভূমিসংস্কারের জটিলতার বিষয় এবং মানুষের অসহায়তার চিত্রও তাই উপস্থাপিত হয় তাঁর গল্পে। আর তখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমাদের পুঁথিসর্বস্ব আওড়ানো বিদ্যা, ভেঙে যায় তাত্ত্বিকজগতের কুহেলি ভারাক্রান্ত যবনিকা, বোঝা যায় ক্ষমতার দাপটের চোরাস্রোতকে। ভূমিসংস্কার আইন জটিল হয়, মানুষ নিরুপায় হয়, দেউনিয়া দানীর কাছে অসহায় মানুষ ছুটে আসে। দানীর কাছে মানুষ হল মক্কেল, তার দুর্গের মতো নতুন দোতলা বাড়ি উঠে, তার কাঠের বাক্সের মাপ বড় হয়, বসার স্থানে তালপাতা চাটাইয়ের বদলে শতরঞ্জি ও তোষকের গদি আসে। সাধারণ মানুষ দেখে রক্তবীজ শিশুপাল দানীর রক্ত খাওয়াকে, দেখে বেড়ার ফসল খাওয়াকে। এ গল্পের নামকরণ থেকে শুরু করে জনতার সংলাপে কিংবা দানীর রথ প্রসঙ্গ উত্থাপনে মহাভারত থেকে মিথ প্রয়োগ করেন গল্পকার। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পর যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে ভীম ও অর্জুন - দুই ভাই সেই রাজ্য পরিদর্শনে গিয়ে সে ভিন্ন চিত্রকে দেখেন, তার মধ্যে অন্যতম চিত্র ছিল বেড়ার আবাদ খাওয়ার দৃশ্য। বিস্ময় চকিত দৃষ্টিতে তা দেখার পর হতভম্ব অর্জুন ফিরে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলে দিব্যদৃষ্টির অধিকারী যুধিষ্ঠির পরবর্তী প্রতীকি হিসাব এ ঘটনার বিশ্লেষণ করেন। অভিজিতের বিশ্লেষণে উঠে আসে এমনতর ঘটনাধারাই যাতে ঢিলার মতো মানুষ ক্রমে নিঃসঙ্গ হয়, নিষ্ক্রিয় হয়। ঢিলা হতাশভাবে দেখে দানী রাজনৈতিক দলের নাম ভাঙিয়ে সাধারণ মানুষের মাথায় আঘাত করে, ভানা বর্মনের মতো মানুষ কেবলমাত্র ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের অংশীদার নয় বলে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হয়। গল্পকার অভিজিৎ দানী কিংবা ঢিলার ভাবনায় তাঁর স্বরন্যাসকে উত্থাপন করেন। বর্তমানে সময়ের কুশীলবদের সামনে কোন অবলম্বন নেই, কোন আদর্শ নেই, জীবনের তাই নেই কোন সার্থকতাও। দিব্যদৃষ্টিতে দেউনিয়া দানী সিংহরায় তাই দেখতে পায়

"রাম শ্যামকে ঠকায়, আবার যদুর কাছে ঠকে রাম। শুধু বেঁচে থাকার ধান্দায় রাম, শ্যাম, যদু পরস্পরকে ঠকিয়ে যাবে, অথবা ঠকাবার চেষ্টা করবে। চোখের সামনে উচ্চতর কোন লক্ষ্য তো নেই। এ যেন রিক্সাওয়ালাদের সন্ধ্যাবেলার জুয়া খেলা। সারাদিনে সবাইতো একইরকম রোজগার করেছে। সন্ধ্যাবেলায় সেই একই রোজগার একের কাছ থেকে অন্যের কেড়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা!"[৮]

ক্ষমতার বদল হলেও শোষণের বদল হয় না, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রযুক্ত চরণ - **"রাজা আসে যায়/ রাজা বদলায়... দিন বদলায় না।"**

তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে ওঠে অভিজিতের উচ্চারণের মধ্যেও "ঢিলা মন্ডল একটা নতুন জিনিস বোঝে। ব্লক অফিস, পঞ্চায়েত,ল্যান্ড রিফর্ম, আদিবাসী অফিস, সমবায় সমিতি, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি যাবতীয় অফিসের মাধ্যমে বন্যার জলের মত সরকারি টাকা আসছে গরিব মানুষের নামে। আর টাকা যখন আসে, তার সঙ্গে থাকে বন্টনের কিছু বিধি নিষেধ। কাজেই নিমিত্ত মাত্র, দানী শুধু প্রতীক, দানী রক্তবীজ শিশুপাল, দানী সর্বত্র আছে। অর্থহীন তার অভিমান।" জমি ব্যবস্থার জটিলতাকে কেন্দ্র ক'রে সংঘাতকে যেমন পরিবেশন করেন লেখক, তেমনই দানীদের রক্তবীজ শিশুপাল হওয়ার চিত্রকে বারংবার উপস্থাপিত করেন। জে.এল.ও অফিসারদের

আপাতভাবে ধর্মপুত্রের মতো আচরণ করা অথচ প্রকৃতপক্ষে দানীর মতোই রক্তবীজ শিশুপাল হওয়ার চিত্র, কিংবা থানার বড়বাবুর সঙ্গে, দেউনিয়ার সঙ্গে অর্থের লেনদেন স্ফীত হওয়ার ছবি তথা জমি সংক্রান্ত যাবতীয় হদিশ পেশ করেন গল্পের বয়ানে। "তারপর একটা আপস হয়। এ আপস আগের বারের মত নয়, এ আপস দুই ধুরন্ধর প্রতিদ্বন্দ্বীর। তারপর সবকিছু চাপা পড়ে যায়। কিছু প্রচেষ্টায় হয়, আর বেশিটুকু হয় নির্বাচনের হাওয়ায়। নির্বাচন সম্পর্কেও লেখকের যথার্থ মন্তব্য : ভোট এমন একটা আশ্চর্য্য রসায়ন যা অনেক বিরুদ্ধ ব্যক্তির মতামতকে কাছাকাছি আনে।

ভারতবর্ষের মতো দেশে একদিকে পোস্টমর্ডানিজমের উত্তাল হাওয়ায় একশ্রেণির মানুষ অবলীলায় ভেসে চলেছে , অন্য শ্রেণীর মানুষকে এক মহাতিমির গ্রাস করেছে। অভিজিৎ এই দেশের পরিপেক্ষিতে তাই ভোটের সরল পাটিগণিত নয়, তার হিসাব নিকাশের ব্যর্থতার তাঁর রসায়নের প্রসঙ্গ নানা সূত্রেই দেখান। তাই দেখি, যে বিমল একদা ঢিলার কাছে রাজনীতি সম্পর্কে হাতে কলমে জেনেছিল, সেই বিমলই বর্তমানে মন্ত্রী হয়ে বক্তৃতামঞ্চে বক্তৃতা দিলে ঢিলা তার কাছে অভিযোগ নয়, আর্জি জানায়। আর্জি জানাতে গিয়ে ঢিলা 'হুজুর' শব্দে বিমলকে সম্বোধন করে। হুজুর শব্দ শুনতে এককালে বিমলের খারাপ লাগলেও বর্তমানে তা মানানসই হয়ে যায়। লক্ষণীয়, এককালের রাজনৈতিক কর্মী ও মন্ত্রীর মনোভঙ্গিজাত বৈষম্যটি। অভিজিৎ বিমলের ভাবনাতেও পুনরায় এদেশীয় ভোটব্যবস্থার যথার্থ স্বরূপটিকে উপস্থাপিত করেন :

"যদিও সে জানে এ দেশে গরদ পরে মন্দিরে গেলে ভোট বাড়ে। রুমাল মাথায় দিয়ে মসজিদে গেলে ভোট বাড়ে, এ্যারোপ্লেনের পাদানিতে দাঁড়িয়ে সদ্য পুত্রহারার গায়ে মাথায় হাত বোলালে ভোট বাড়ে , দুদিন আগে যার স্বামী খুন হয়েছে তাকে ভোটের বাক্সে জবাব দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেও সত্যিই ভোট বাড়ে।"৯

কিন্তু সেই মন্ত্রী মানুষটি ঢিলাকে চিনতে পেরে মঞ্চে থেকে নেমে নিজের কাছে টেনে নিতে পারে না, কেননা ঢিলাকে তারা নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে, তাকে আপনার করে নিতে গেলে সমবেত জনতার কাছে তা ভোট চাওয়ার ছলনা বলে মনে হতে পারে। মন্ত্রী তাই তড়িঘড়ি মঞ্চ থেকে নেমে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড আমলের ডাক বাংলোয় উঠে যায়। ঢিলাকে সেখানে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে। পুরনো আমলের ডাকবাংলোয় পৌঁছে মন্ত্রীর মনে পড়ে যায় ঢিলার সঙ্গে পুরনো রসিকতার প্রসঙ্গ, মন্ত্রী লহমায় পৌঁছে যান পুরনো দিনের প্রসঙ্গে। কিন্তু ঢিলা মন্ডল মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসে না, বিধু বা মন্ত্রীও চায় না প্রসঙ্গে তা বেশি গভীর ভাবে নাড়াচাড়া করে দেখতে। এ আমাদের সময়ের বৃত্তান্ত, ক্ষমতা দাপটের হিগমনির ন্তরালে মানুষের হারিয়ে যাওয়ার বৃত্তান্ত। এই গল্পের অনুসরণে আইনশৃঙ্খলা' গল্পটির পর্যালোচনা জরুরি। এই গল্পেও গ্রামের জমি সংক্রান্ত মধ্যস্থানীয় ব্যবস্থার রূপান্তরের কাহিনী এবং শ্রেণীর সম্পর্কের জটিল টানাপোড়নের বিষয়টিকে পরিবেশন করেছেন গল্পকার। এই গল্পটিতেও অভিজিৎ প্রচলিত ছোটগল্পের সীমারেখায় বিষয়টিকে মানেননি। ছোটগল্পকে খন্ডিত জীবনের অনুভবের কাহিনি করেই গড়ে তোলেন নি, বরং সামগ্রিক জীবনের রূপদানেই সচেষ্ট হয়েছেন। নিবন্ধকারের মতো ভাষ্য সংযোজনার মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিমন্ডলটিকে উপস্থাপন করেছেন এবং ভূমিসংস্কারের জটিলতা, গ্রামীণ শ্রেণি সম্পর্কের শাসন শোষণের নানা দিকটিও তিনি প্রদর্শন করেছেন একই গদ্য যোজনার মধ্য দিয়ে। অভিজিৎ সেন দেখান বাস্তবকে প্রতক্ষ্যদর্শি রূপে। তিনি দেখান-

"আইনের সংখ্যা যত বাড়ে, ফ্যাকড়া তত বাড়ে! ফ্যাকড়া যত বাড়ে পয়সা আসার অলিগতি ততই বেশি ক'রে গজিয়ে ওঠে।.... সব পক্ষেরই এবং সব প্রশাসনের লক্ষ্য যাতে স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। বর্তমান প্রশাসনও সেদিক দিয়ে ব্যতিক্রম নয় ! আইন শৃঙ্খলার সমস্যা না হয়, প্রতিপক্ষ কোনো রকম নালিশ না উঠাতে পারে সেদিকে দল ও প্রশাসন বড়ো কড়া নজর রাখে। ... স্বজন পোষণ ও পয়সা বর্গা রেকর্ডের ক্ষেত্রে এবার বিরাট ভূমিকা নিয়েছে।"১০

এই গল্পে ও শ্রেণী সংগ্রামের পটভূমিতে প্রান্তিক চাষীদের জোতদারের জাঁতাকলে নিষ্পেশিত হওয়ার কাহিনি অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গটির ও বারবার উল্লেখ

করেছেন। লেখকের বর্ণনায় তার অন্তঃসারশূন্যতার দিকটিও চিহ্নিত হয়েছে - **ফলে বিষয়টা যাবতীয় বিবেচনায় উর্ধ্বে আইনশৃঙ্খলা নামক এক শিখন্ডীর দপ্তরে চলে যায়।** চাষীদের সংলাপেও প্রসঙ্গটিরই উল্লেখ রয়েছে - "আইন ছিংখলা ?"

-- নাগরোৎ ভাসামো। পেটেৎ ভাত থাকলে আইন, পাছাৎ কাপড় থাকলে ছিংখলা। কিংবা যোগেন যে আখিরা ও বোলতরার কমরেট্ হিসাবে পরিচিত, সে-ও জোতদারের দালালী করতে গিয়ে বলে ওঠে : "আই শৃঙ্কলা নিজের হাতে নেওয়া চলবে না। আইন ভঙ্গ করা চলবে না।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য অভিজিৎ কুশলতার সঙ্গে পরিবেশন করেন জোতদারের সুযোগ বুঝে বিশেষ রাজনৈতিক দল ঢুকে পড়াকে - "ভোটের পরে নতুন জামা অনেকেই গায়ে দিয়েছে। সতীশের জামাটা তার ভেতরে একটু বেশি রঙিন। তবুও এই নতুন কর্মীরাই টুইলার মতো প্রান্তিক চাষীদের গ্রাস করে, তাদের আধিজমি কেড়ে নিতে চায়। সাঁঝালুর মতো ক্ষুদ্র চাষীদের জমি বেদখল হয়। জিতেনের জমি ভাগচাষ করত সাঁঝালু। জিতেন সেই জমি হরাকে বিক্রি করে। হরা সেই জমির দখল নেয়। টুইলা যেহেতু প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে অন্যতম সফল চাষী তাই টুইলার জমিই হস্তগত করে সতীশের মতো জোরদার চাষী। যোগেনের মধ্যস্থতায় দু'একজন প্রান্তিক চাষী বশ মানলেও টুইলা তা মানতে চায় না, কেননা জমির থেকে বড় তার কাছে আর কিছুই নেই। মহেন্দ্র আধিয়ারদের নেতৃত্ব দিলে এবং টুইলা তার মতের দৃঢ়তা বজায় রাখলে সাময়িকভাবে জোতদাররা নিরস্ত থাকলেও রেষারেষি, দুরভিসন্ধি বা চক্রান্ত বজায় থাকল। এর আগেই যোগেনকে আধিয়ারদের উপিনের মতো ছেলের দল কালি পড়া এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি মাথায় পরিয়ে দেয়। এবার জোতদাররা মহেন্দ্রের পুকুরে ঢেলে দেয় বিষ, মহেন্দ্র পুত্র উপিনও পরের দিন তাদের কয়েকটি পুকুরে বিষ ঢেলে তার বদলা নেয়। টুইলার বাড়িতে ডাকাত আসে, তাকে হত্যা করে তারা, তার বধূ কুশলী সেই ডাকাতদের দ্বারা ধর্ষিত হয়। সংজ্ঞাহীন কুশলীকে পরের দিন হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাণ ফিরে পায়, কিন্তু হারায় বাকশক্তি। তার গর্ভে থাকা চারমাসের শিশু সন্তানটি বেঁচে থাকে। প্রমত্ত পশুদের দ্বারা কুশলী ধর্ষিত হওয়ার পরেও টুইলার উত্তরাধিকারী বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে অভিজিৎ সংগ্রামের জায়মানতার দিকটি প্রতীকায়িত করেছেন। গল্পটি এরপর অন্যস্তরে পৌঁছায়। টুইলার জমি আমন মরসুমে আবাদ না হয়ে পড়ে থাকে। ক্যালেন্ডারে ছবি তোলা টুইলা ও কুশলীর সবুজ ফসলে ভরা মাঠ আগাছায় রূপান্তরিত হয়। জমি চাষ না করে ফেলে রাখার জন্য সুযোগ বুঝে জমির মালিক সতীশ কোর্টে নালিশ করে টুইলার স্ত্রী কুশলীর বিরুদ্ধে। মহেন্দ্র বাকশক্তিরহিত, বিহ্বল দৃষ্টির অধিকারী কুশলীকে নিয়ে কোর্টে আসে, লড়াইকে অব্যাহত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কোর্টের মধ্যে দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারে নিজেরও স্বামীর ছবি দেখে কুশলীর মস্তিষ্কে উপলব্ধির সঞ্চার হয়। কুশলীর শরীর স্বেদসিক্ত হয়ে ওঠে। মহেন্দ্রর স্ত্রী চেলামণি কোর্টের বাইরে পুরুষমানুষদের চলে যেতে বলে। "দরজার বাইরে হতভম্বের মতো মামলাবাজ মানুষ, উকিল, হাকিম এবং আগ্রহী মহেন্দ্র বিমূঢ় হয়ে থাকে। খানিকক্ষণ পরে নবজাতকের প্রথম ঘোষণা শোনা যায় তীব্র চিৎকারে।" যে সংগ্রাম টুইলার মৃত্যুতে সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল টুইলর সন্তানের তথা নবজাতকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে সংগ্রামের ঘোষণা যেন প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে। মহেন্দ্র যে সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে, টুইলার অবর্তমানে বাকশক্তিরহিত কুশলীকে নিয়েই কোর্টে এসেছে, পিছু হটেনি। সুতরাং সে আবেগে দীপ্ত হয়ে ওঠে। হাকিমকে সে একথা বলতে দ্বিধাবোধ করে না - **মিরতো আধিয়ার টুইলা বম্মনের ওয়ারিশ আপনার এজলাশোৎ হাজির।** এ যেমন উত্তরাধিকারের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সরব ঘোষণা, তেমনি সেই ঘোষণায় বর্তমানের আইন শৃঙ্খলাকে তছনছ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ধ্বনিত হয় - "সেই শব্দে বন্ধ ঘরের কাঁচের দরজা, জানালা ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে।" উপনিবেশোত্তর ভারতবর্ষে যে আইন জনগর্ণের মুখে দুবেলা দুমুঠো খাবার তুলে দিতে পারে না, যে শৃঙ্খলা মানুষের ন্যূনতম লজ্জা নিবারণের উপায়টুকু রাখে না, রমনীর ইজ্জতটুকু রক্ষা করতে পারে না সেই আইনশৃঙ্খলা আসলে, তার প্রয়োজনা কতটুকু?

অন্যদিকে **'ব্রাহ্মণ্য'** গল্পে যুগ যুগ বাহিত সংস্কারের শিকড় আমাদের লোক সমাজে, যেমন প্রচলিত, তেমনি তা ভিন্ন ধরনে বহমান

আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত সমাজেও। অভিজিৎ তাঁর একাধিক গল্পে ব্যাঙ্ককর্মী কে চরিত্র অঙ্কন করেছেন, কোন কোন গল্পে কথক চরিত্রটিই ব্যাঙ্ককর্মী। 'ব্রাহ্মণ্য' গল্পে নচিকেতা রাইনগরের ব্যাঙ্ক কর্মী। নদীখাতে পৃথক হওয়া নিম্নভূমির এই অঞ্চলটিতে মানুষ নিরুপায় হয়েই বাস করত। নিম্নবর্গ অধ্যুষিত এই অঞ্চলটিতে মানুষ ছিল খুবই দরিদ্র কারণ সেখানে ফসল হত প্রায় নামমাত্র। সুতরাং সেই দরিদ্র মানুষদের কাছে ব্রাহ্মণদের প্রাপ্তি বলতে কিছু ছিল না, তাই সচরাচর তাদের আগমন ঘটত না। অবহেলিত মানুষগুলির কাছে অন্যান্য বহু প্রত্যাশিত অথচ দূরবর্তী বস্তুর মতই ব্রাহ্মণও ছিল কাঙ্ক্ষিত ও অভিপ্রেত। কিন্তু গত বি-পঁচিশ বছরে বরিন্দের এই অঞ্চলের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগেই বলেছি অভিজিতের ছোট গল্পে এই পরিবর্তনের অনুপুঙ্ক্ষ পরিচয় আমরা পাই একাধিক গল্পে। পাম্প বসিয়ে সেচসেবিত এই অঞ্চলে অসময়ে ও উচ্চফলনশীল ধান উৎপাদন করা হয় ।দরিদ্র মানুষ গুলি বর্তমানে রাজনৈতিকপ্রেক্ষাপটে। শোষকের শোষণ কৌশলের অভিনব উপায়, রাজনৈতিক দূরবর্তী বস্ত ব্রাহ্মণকে কাছে পাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। উত্তর উপনিবেশকালে ভিন্ন বয়ান রচনায় উৎসাহী অভিজিৎ লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস, সংস্কার কিংবা শ্রেণী সংঘাতকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি দেখিয়েছেন উপনিবেশিক সংস্কৃতির শিক্ষার অহমিকাতেও। তাই ঔপনিবেশিক শিক্ষায় মানুষ আধুনিক হয়ে উঠেছে, কিন্তু সংস্কারের নির্মোক অন্তর থেকে উপড়ে ফেলতে পারে নি।

'ব্রাহ্মণ্য' গল্পে ভূমিসংস্কারের প্রসঙ্গ উঠে এলেও এ গল্প অন্যমাত্রিক, এ গল্প মানুষের আর এক জটিল জিজ্ঞাসাকে সামনে আনে। মহাদেব, তার ভাই, তার স্ত্রী তথা পরিবার ব্রাহ্মণ সম্পর্কে, জাতি বর্ণ সম্পর্কে যুগ যুগ বাহিত যে সংস্কার বহমান সেই গভীর সংস্কারেই প্রবলভাবে বিশ্বাসী। অন্যদিকে আপাত ভাবে সংস্কার মুক্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নচিকেতা ও কেতকীর অন্তরে সংস্কারের বীজ উপ্ত হয়েছে অন্যভাবে। রাইনগরের দুর্গম গ্রামে কৃপাভিক্ষু আজও অপেক্ষা করে ব্রাহ্মণের জন্য। ব্রাহ্মণ পেলে তাদের আহ্লাদের শেষ নেই, তাদের পায়ে মাথা ঠুকে, মৃত্যুপথযাত্রিণী খায় পা ধোওয়া জল। যে পানের বোরজে নারীর প্রবেশ নিষেধ তাদের কাছে, সেই পানের বোরজে ব্রাহ্মণ নারী প্রবেশ করতে পারে অনায়াসে। অথচ নচিকেতা বা কেতকী অন্য শিক্ষায় বড় হয়ে উঠেছে। নচিকেতার মত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ জানতই না যে বরিন্দে দুর্গম অঞ্চলের মাহিষ্য, সদগোপ, কৈবর্ত, তন্তুবায়, তামলী, বারুই প্রভৃতি সমাজের মানুষগুলি পুণ্যার্জনের আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে একালেও অপেক্ষা করে আছে। আবার হাঁড়ি, ডোম, ভুঁইমালী, ব্যাধ, চন্ডাল ইত্যাদি মানুষরা ব্রাহ্মণ দেখতে পায়-ই না। কেননা তারা এখনো ঘোর পাপী। অথচ : "গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র মার্কসবাদ ফালাফালা করেছে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। রাইনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তৃত্ব লাল ঝান্ডাবাহী একটি দলের হাতে। মহাদেবের ছোট ভাই শিশু পঞ্চায়েতের একজন সদস্যও। কিন্তু ব্রাহ্মণ ভক্তি তারও কিছু কম নয়।" উপনিবেশিক শিক্ষার স্পর্শরহিত গ্রামীণ পরিমন্ডলটিকে যথার্থ দক্ষতায় চিহ্নিত করার পাশাপাশি গল্পকার নচিকেতা কেতকীর অন্তর্লোকের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। নচিকেতা পৈতে কিনে এনেছে বাজার থেকে। এ ঘটনা তার স্ত্রী মেনে নিতে পারে না। সত্তরের দশকে কলকাতায় কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় তারা কলেজ জীবন কাটিয়েছে। বিয়েও হয় রেজেস্ট্রির মাধ্যমে পৈতে যেখানে অবাঞ্চিত। কেতকী চায় তার ছেলে যথার্থ আধুনিক হোক। কিন্তু নচিকেতাকে আজ কোন ভূত পেয়ে বসল সে তা উপলব্ধি করতে পারে না। এর মাধ্যমেই গল্প অন্য বৃত্তান্তে পৌঁছায়, পৌঁছায় নচিকেতা কেতকীর বৃত্তান্তে। গোষ্ঠী থেকে পরিবার জীবনের মধ্যে , লোকায়ত দেশজ পরিবেশ থেকে শহরে নাগরিক নরনারীর জীবনের মধ্যে। নচিকেতা গ্রামীণ মানুষজনের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে চায়, চায় না তাদের অনাবশ্যক আঘাত দিতে। রাইনগরের পঞ্চায়েত, উন্নয়ন, রাজনৈতিক দলের গ্রাম্য নেতার রক্তচক্ষু টাউট দালাল মস্তানের ষন্ডামি, সরকারি আমলার অশোভন কর্তৃত্ব - সবকিছু মেনে এই সব মানুষের সঙ্গেই একবার সুস্থির ভাবে চাকরি বাঁচিয়ে রাখতে চায়। - "সে শুধু কেতকীকে বোঝাতে চেয়েছিল এই সব মানুষ এত অসহায় যে জাতপাত, ধর্মাধর্ম বিষয়ক নাগরিক মূল্যবোধ এখানে অকারণ দুঃখবর্ধক হবে।" অথচ কেতকীর

বিষয়টি প্রবঞ্চনার মতো মনে হয়। কেতকী ব্রাহ্মণ নয়, কায়স্থ। এই কারণে নচিকেতার মা তার হাতের ছোঁয়া জল খেতে চান নি, নচিকেতার অসবর্ণ বিবাহে আহত হয়ে অল্পকালের মধ্যেই বাবার অকাল মৃত্যু ঘটে। নচিকেতা কেতকীকে বোঝাতে চায় যে উভয়ের মা বাবার যথাক্রমে ঘৃণা ও ভয় পাওয়ার মধ্যে তাদের অন্তরের গভীরে ক্রিয়াশীল জাতের শিকড় তথা সংস্কার। কেতকীও জানে যে এদেশের ব্রাহ্মণদের একাংশ রাজা আদিশূরের সময় রাজকোষে উৎকোচ দিয়ে ব্রাহ্মণ হয়েছে। অথচ সেই কেতকীর নামে একখানি চিঠি জনৈক সন্তোষ কুমার মিত্র প্রেরণ করলে পিতামাতার মতো তাদেরও এই জাতি জনিত সংস্কার মনের মধ্যে তোলপাড়া করে। সে চিঠিতে অপরিচিত ব্যক্তিটি নিবেদন করেছে যে কেতকীর পিতামহ শশধর ঘোষ আদতে সদগোপ্ বংশোদ্ভব হলেও দেশভাগের কিছু পূর্বে এদেশে এসে বংশপরিচয় গোপন করে নিজেকে কুলীন কায়স্থ হিসাবে পরিচয় দিতে শুরু করে। চিঠিতে এই খবর পড়ার পর কেতকী তার বাল্যকাল থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত বাড়ি জাতপাত বিষয়ক যাবতীয় কথাবার্তা, আচার-আচরণ অনুপুঙ্ক্ষভাবে পর্যালোচনা করে দেখে যে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় না। অথচ এতকাল পর্যন্ত নিজেকে উচ্চ কায়স্থ বংশীয় ভেবে গর্ববোধই করেছে। এই অহংবোধ তাকে পীড়িত করে, নিরালায় একাকী ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে সে, অন্যদিকে নচিকেতা অনুভব করে যে কেতকীর কলশীল বিষয়ক জটিলতা তার মধ্যেও পাকিয়ে দিচ্ছে এক ধরনের জট - "এখন হঠাৎ তার মনে হয় সঙ্গীত, সাহিত্য, ফিল্ম, নাটক, শিষ্টাচার, সংবেদনশীলতা ইত্যাদির পাঠ সে এবং কেতকী কি একই মানের পেয়েছে? টেপরেকর্ডার, টিভির বিষয় থেকে শুরু করে ভল্যুমের মাত্রা নির্ধারণ, রবীন্দ্রনাথের গান থেকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্যে, পরিচারিকার সঙ্গে ব্যবহারে কিংবা দাক্ষিণ্যের অপ্রতুলতায় আচমকা লেনদেনের মধ্যে অবিবেচক সূক্ষ্ম স্বার্থপরতায়, অর্থাৎ রুচি, ন্যায় নীতি, শিষ্টাচার, সৌজন্য ইত্যাদি শিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত ধারাবাহিক সংস্কৃত মানসিকতার পাঠশালা তার আর কেতীর কি এক? এতকাল অস্বস্তি লেগেছে, কিন্তু সে নিজে হয়ত একটু বেশি বাতিকগ্রস্ত অথবা সংবেদনশীল নচিকেতা এরকম একটা নিষ্পত্তি করেছে নিজের সঙ্গে। কিন্তু গত দশ বারোদিন ধরে এই নতুন অস্বস্তি তাকে গোপনে পীড়া দিচ্ছে।" তার মনে পড়ে যায় যে বম্বেতে ট্রেনিংয়ের সময় অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরীর নাম পদবী পরিবর্তনের ফলে অপমানিত হওয়ার দৃশ্যটাকে, কিংবা অকর্মণ্য, নেশাখোর পাঁচুর ব্রাহ্মণ্য মনোভাবকে জাহির করার প্রচেষ্টাকে কিংবা গ্রামের অন্যান্য মানুষদের 'চাষা' বলে ঘৃণা করার প্রচেষ্টাকে। এরপর অভিজিৎ ইঙ্গিতে নিহিতার্থে আমাদের যুগ যুগ ধরে অন্তরে প্রোথিত অন্ধকারকে দেখালেন : "সিঁড়ির নিচে বিকেলের ছায়া ঘন হয়ে এসেছে, সেই আবছায়ায় দাঁড়িয়ে সে ক্রমশ বিষন্ন হতে থাকে।" নচিকেতার মনে হয় পাঁচু অনিরুদ্ধ শশধর, সে নিজে মহাদেব ভৌমিক ও তার পরিবার, শশধর ও তার উত্তরাধিকার প্রত্যেকেই এক প্রবল সংস্কারের শিকার। নগরী কলকাতায় আধুনিকতার আলো পাবে এই মনে করেই নচিকেতা ও তার স্ত্রী কেতকী পুত্রকে ছেড়ে বাস করছে। বর্তমানের আবছায়া আঁধারে দাঁড়িয়ে নচিকেতার মনে হয় সে আলো কৃত্রিম, আরোপিতা, বাহ্যিক আমাদের মনোজগতের অন্ধকারকে দূর করতে পারে না। লহমায় নচিকেতা ভবিষ্যৎকে দেখতে চায়, উত্তরাধিকারীর জন্য তাই তার অন্তর কেঁপে ওঠে : **"কলকাতায় পড়ে থাকা তাদের শিশুটির জন্য নচিকেতার মন হঠাৎ হু হু করে ওঠে।"**[১১]

গঠনের দিক দিয়ে ছোটগল্পটি এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু অভিজিৎ এই ইতিবাচক জগৎকে তাঁর গল্পের পরিণতিতে দেখান। মৃত্যুপথযাত্রীনি মহাদেব ভৌমিকের স্ত্রীর শেষ আকাঙ্ক্ষা কেতকীর উপস্থিতিতে পূর্ণ হয়, মৃত্যুর পূর্বে কেতকীর পায়ের ধূলো দেওয়া হয় তার মাথায়। সমবেত স্বরে ক্রন্দন করে নারীরা, ময়না পাখিটি জিজ্ঞাসা করে তার মা কোথায় যাচ্ছে, পুরুষরা ক্রিয়াকর্মে ত্রুটি যেন না হয় এমন ঘোষণা করে। এর মধ্য দিয়ে কৌম সমাজের সংঘবদ্ধতার দিকটিকেই উপস্থাপিত করেন গল্পকার, দেখান সংস্কারে নিমজ্জিত মানুষগুলি পরস্পরের বিপদে একত্রিত হয়ে কাজও করতে পারে।

'লখীন্দর ফিরে আসবে' গল্পেও স্বতন্ত্র এক জগৎ দ্বারা প্রচলিত বয়ানের বিপরীত বয়ান গড়ে তোলেন লেখক। আধুনিকতার একটি অন্যতম

বৈশিষ্ট্য যুক্তিবোধ। কিন্তু যুক্তি দিয়েও সমগ্র জীবনকে বিচার করা যায় না। পোস্ট মর্ডান পিরিয়ডে যুক্তিকে ব্যঙ্গ করা হয়। 'লখীন্দর ফিরে আসবে' গল্পে লেখক বাস্তব ও অবাস্তবের কুহকে বিশ্বাসকে জগৎ নির্মাণ করেছেন। আধুনিকতার সঙ্গে আমাদের প্রাচ্য ভাবনার পার্থক্য আছে। আমরা যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, যারা প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত তারা সর্বদাই দেশজ পদ্ধতির চিকিৎসা বিদ্যার বিরুদ্ধচারণ ক'রে থাকি, অথচ সেই সব কিছুকে মন থেকে দূর করে দিতেও পারি না। 'লখীন্দর ফিরে আসবে' গল্পে অশোকের বক্তব্যেরও আচরণের মধ্যে এই বিষয়টি কার্যকর। শিক্ষক সম্মেলনে মেদিনীপুর যেতে গিয়ে কথক চরিত্রের সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে দেখা হয় এককালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী অশোক ও অণিমার সঙ্গে। অশোক ও অণিমা বর্তমানে স্বামী স্ত্রী, এসেছে উত্তরবঙ্গের কোনও জেলা সদর থেকে। এমন সময় দেখা যায় বছর তিরিশেক বয়সের এক দম্পতি অশোক ও অণিমাকে যথাক্রমে বাবা ও মা ব'লে সম্বোধন করছে এবং অশোক ও অণিমাও তাদের প্রতি এক অপার বাৎসল্যের টানে কথা বলে চলেছে। তারা বিদায় নেওয়ার পর 'আমি' জিজ্ঞাসা করি উক্ত দম্পতির পরিচয় সম্পর্কে এবং এই প্রসঙ্গে আসে কমল সাধুর বৃত্তান্ত। গল্পের মধ্যে গল্পকে নিয়ে এসেছেন অভিজিৎ। অতিপ্রাকৃত আবহে নির্মিত গল্পে একটি বৃত্তের অভ্যন্তরে একটি বৃত্ত থাকে। বহির্বৃত্তটিতে অতিপ্রাকৃত বাতাবরর থাকলেও অভ্যন্তরীণ বৃত্তে থাকে মনঃস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ - গল্পটি হয়ে ওঠে মনোবিশ্লেষণের গল্প। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি প্রসঙ্গত মনে পড়ে, যেখানে প্লাটফর্মের আবহে একটি গল্প শুরু হয়েছে আর অন্যটি গড়ে উঠেছে শীহাবাগের রাজপ্রাসাদে। 'লখীন্দর ফিরে আসবে' গল্পেও তাই কথক চরিত্রের পালাবদল ঘটে। অশোক হয়ে যায় অভ্যন্তরীণ বৃত্তের কথক। কমল সাধু এককালে ছিল অশোকের অর্থাৎ 'আমি'-র প্রাণের বন্ধু। পড়া ছাড়ার পর সে হাটে ব্যবসা করত জিনিসপত্র কেনাবেচার। হঠাৎ সে শহর ছেড়ে চলে গেল এবং তিন চার বছর পর ফিরে এসে গ্রামগঞ্জের মানুষকে নানা নিরাময় ও স্বপ্নসম্ভবের ভেষজ বিক্রি করত। 'আমি' এই বিষয়টিকে বুজরুকি বলেই মনে করত এবং কমলের প্রতিও সে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করত। কমলের শক্তি পরীক্ষার জন্য 'আমি' তার দেহের চুলকানি রোগটি কমলকে দেখায় এবং কমল তাকে চুলকাতে নিষেধ করার টোটকা বলে ও দশদিনের জন্য দশটি বড়ি খেতে দেয়। তিনদিন ঔষধ খাওয়ার পর 'আমি' সেই ঔষধের ইতিবাচক প্রক্রিয়া টের পায় - "আমি পরিস্কার বুঝতে পারছিলাম যে, আমি যে দুজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছিলাম, তারা কেউ ধরতে না পারলেও, কমল বোধহয় ঠিকই ধরেছিল যে কোনও এক ধরনের মানসিক ছাপ, যাকে ইংরাজিতে ডিপ্রেসন বলে, আমাকে শারীরিক বিকারে নিগৃহীত করার রাস্তা খুঁজে নিয়েছে। এতদিন ধরে যেসব ব্যাপারে নিজের কাছেও অস্বীকার করতে চেষ্টা করতাম, কমলের সঙ্গে কথা বলার পর কেমন যেন সব উলঙ্গ হয়ে প্রকাশ পেতে লাগল।" মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পঙ্গু মানসিকতাকে পরিবেশন করলেন গল্পকার , বাহ্যিক শোভনতার অন্তরালে দগদগে ক্ষতকে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টাকে দেখালেন তিনি। তাই দেখি, কমলের ওষুধ ফেরত দেয় আমি অথচ তার টোটকা যথাসম্ভব অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। এই ঘটনার পর হঠাৎ শেঅনা যায় যে কমল সাধু সর্পদংশনে মৃত এক ব্যক্তির জীবন ফিরিয়ে দেবে। 'আমি' নদীর ধারে কমল সাধুর কীর্তিকলাপ দেখতে যায়। সেখানে দেখে কমল সাধুর কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিকে এবং নদীর পার থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত খুব সুন্দর ক'রে সাজানো একখানি ভেলাকে । মৃত মানুষটিকে স্বজনদের নির্মিত ভেলাটির গঠনসজ্জা এবং ভেলাটিতে প্রদত্ত গ্রাম্য পটুয়ার হাতে আঁকা ছবি ও পটের অনু পুঙ্খ বিবরণ প্রদান করেন গল্পকার। আসলে এর মধ্য দিয়ে দেশজ শিল্প তথা দেশজ প্রক্রিয়ার প্রতি লেখকের বিশেষ প্রদ্ধা ও আকর্ষণের দিকটি স্পষ্ট হয়। রাতে আমি আবার নদী তীরে উপস্থিত হলে গায়ক ও বাদকের যুগপৎ সম্মিলনে পরিবেশিত মনসার ভাসান গান শুনতে পায়। মূল গায়েনের পদ কিছু বুঝতে না পারলেও 'জলে ভাসিল রে ও মোর নয়নের তারা - ভাসিল রে - " এই ধুয়া পুনঃপুনঃ শোনার ফলে এক সর্বৈব বেদনাবিধুরতা সর্বাঙ্গ স্পর্শ করল তাকে। বাস্তব ও অবাস্তব জগতের সহায়তা এক কুহকী বাস্তবের নির্মাণের মাধ্যমে এক অনৈসর্গিক পরিমন্ডল রচনা করেছেন

গল্পকার। যে 'আমি' মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশীদার, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, কমল সাধুর টোটকাকে চাতুরি বলেই মনে করে সেই 'আমি' মুহূর্তের মধ্যেই পরিবর্তিত হয়ে গেল। "জগতের যত হতাশা, কান্না আর ব্যথা, যত হাহাকার, না পাওয়া এবং আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্ক, আধিভৌতিক আর আধিদৈবিক যতসব দুঃখে আর শঙ্কা, জগতের যত অমঙ্গল -এই সবকিছু থেকে রেহাই পাবার জন্য নিসর্গ যেন এক প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছে। ওই যে কজন মানুষ ওখানে বসে আছে নদী এবং গাড়ির সংযোগের অর্ধচন্দ্রে যারা কোনও মতে চালা তুলে গৃহস্থালী করে আর এই শহরের আর সব মানুষ যারা বিশ্বাস এবং সংশয় সত্ত্বেও উন্মুখ হয়ে আছে, এই নদী পথের গ্রাম নগর, যারা এই কলার মঞ্জুষের ভিতরে এই বালিকার মুখ মৃত দেখে 'জয় মা বিষহরি' বলে ধ্বনি তুলছে, তাদের সবার সঙ্গে আমিও যেন প্রার্থনা করতে লাগলাম, জিয়াও সাধু, তুমি ওকে জিয়াও।" কিছুক্ষণ পর সচেতন হতে 'আমি' লক্ষ করল ইঁদুরের চলে যাওয়াকে, তার মনে হল বিষহরির থান, জল এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠান পরিবৃত অঞ্চলে বেশিক্ষণ থাকাটা ঠিক নয়। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত 'আমি' বিশ্বাসবাদে আক্রান্ত। পরের দিন 'আমি' লোকমুখে শোনে যে, কমল সাধু তিনদিন আগে সর্পদংশনে আহত এমন ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনার পর 'আমি' কমল সাধুকে এড়িয়ে চলে, কেননা দৈনন্দিন জীবনবোধ তথা আদর্শের বিষয়ে দু'জনের মধ্যে রয়েছে আশমান-জমিন ব্যবধান। এই ঘটনার মাস চারেক পর এক মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে 'আমি'-র বাড়ি উপস্থিত। ওই মধ্যবয়সী মহিলার দাবি যে 'আমি'-র পা ছোঁওয়া জল তার পুত্র খাবে, কেননা গত জন্মে তার পুত্রের পিতা ছিল 'আমি' এবং তাকে সে যথেষ্ট অবহেলা করেছে। যুক্তিবাদী 'আমি' তা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। অথচ 'আমি' দেখে যে পিতা একদা চিকিৎসক, আজীবন মার্কসবাদী, বাড়ি থেকে বহুপূর্বেই লক্ষ্মীর পাট উঠিয়ে দিয়েছেন, তিনিও পুত্রকে পাদোদক প্রদানের ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করছেন। অবশেষে 'আমি' তা দিতে বাধ্য হয় এবং জেনে নেয় যে কমল সাধুর পরামর্শক্রমে ঐ মহিলা ও তার পুত্র এসেছে। একসময় ডিওদেনাল আলসারে ভোগা এই ছেলেটিই বর্তমানের গোপাল। এই ভাবে এক বিশ্বাসের পরিমন্ডলকে নির্মাণ ক'রে গল্পের অন্তিমে ফিরে আসেন বর্তমানের চলমানতার মধ্যে : **"চল, আমাদের গাড়ি দিয়েছে । ওই যে ফেস্টুন খুলে দাঁড়িয়েছে কমরেডরা।"**

লোকায়ত কৌম সমাজের মধ্যে সংস্কারের অন্ধকার কতখানি গভীর **'জেহাঙ্গী'** ছোটগল্প অভিজিৎ তা দেখিয়েছেন। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের সাঁওতাল গৃহবধূ জেহাঙ্গীকে ডাইন সন্দেহে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে তারই ভাশুরের ছেলে রেংটা। রেংটার পরিবারে কতকগুলি অস্বাভাবিক তথা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। তাদের বাড়িতে ডাকাতি হলে তারা সর্বস্বান্ত হয়, ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে রেংটার বড় ভাই মারা যায়। এর কিছুদিন পর তার বাবা মারা যায়। এদের সকলকেই সে খুব ভালবাসত। কবিরাজ, মাহান বা গুণমানদের কথায় রেংটা বিশ্বাস করে যে সাঁওতাল রমণীরা ডাইন হয়, তার শ্বাশুড়ী ডাইন ছিল, যদিও সে ডাইন নয়। জেহাঙ্গীর স্বামী মাট্রিক পাশ, সাঁওতাল সমাজে শিক্ষিত, তবুও সে বিশ্বাস করে যে মানুষ যদি কারো মঙ্গল করতে পারে, তবে তার নিশ্চয়ই অমঙ্গল করাও সম্ভব। সুতরাং তার বিশ্বাস যে একজন সাঁওতাল নারীর পক্ষে ডাইন হওয়া সম্ভব। জেহাঙ্গীর ভাই সুফল মার্ডির কাছে আহত জেহাঙ্গী দৌড়ে গিয়েছিল বাঁচার জন্য, সে সুফলকে ডাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে আর্ত ও সন্ত্রস্ত হয়, নিরুপায় হয়ে নিরুত্তর থাকে এবং অবশেষে বলে : "জেহাঙ্গী বড় জেদী মেয়ে, স্যার তবে ডাইন বোধহয় সে নয়। " আহত জেহাঙ্গীকে বারংবার রেংটা টাঙ্গিতে আঘাত করলে কৌম সাঁওতাল সমাজের কেউই বাধা দেয়নি, বাধা দিয়েছিল কেবলমাত্র তার ভাই সুফল আর আমবাগানে বাগান ইজারা নেওয়া লোকজন, যারা সাঁওতাল নয়। এই ঘটনার পর জেহাঙ্গী বেঁচে উঠলে এবং চার বছর পর সে ঘটনার বিচার হলে জেহাঙ্গী জানায় যে রেংটা তাকে আঘাতকরেনি। সাক্ষী হসটাইল হলে এবং রেংটা ছাড়া পেলে স্বজন ও গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়, একত্রিত হয় জেহাঙ্গী-রেংটা-জলপা প্রত্যেকেই, কেউ রেংটার প্রতি বিরূপ আচরণ করে না। লোকায়ত কৌম সমাজের আদিদৈবিক ও আদিভৌতিক জগৎকে নির্মাণের দ্বারা লেখক সত্যের এক স্বতন্ত্র জগৎকে

উদ্‌ঘটান করলেন। আসলে, আমাদের দেশের লোকায়ত সমাজে সংস্কার, অলৌকিকতা,ডাইন, ঝাড়ফুঁক, ফোকসিন, যাদু ইত্যাদি বিষয়গুলি গভীরভাবে রয়েছে।

অভিজিতের ছোটগল্পের আলোচনায় বলা যায় যে, প্রথাগত প্রতিবেদনের বিপরীতে স্বতন্ত্র স্বরূপে তাঁর ছোটগল্পে পাওয়া যায়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি কালে নানা বিপর্যয় ও জিজ্ঞাসায় বাঙালি যখন জর্জরিত, সেই কালপটভূমিতে লেখকের মনোভূমি গড়ে উঠেছে। এই সময় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, যৌথ পরিবারগুলি যাচ্ছিল ক্রমশ ভেঙে। অর্থনৈতিক ক্লিষ্টতা, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলনও এই সময়ই পরিলক্ষিত হয়। মধ্যবিত্ত মানুষের মূল্যবোধগুলি পরিবর্তিত হচ্ছিল, সে ক্রমশ নানা সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছিল। এই সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কালে মানুষকে, সমাজকে ব্যাপকভাবে চিনেছেন। নিজের সম্পর্ক এবং এই কালপর্ব সম্পর্কে অভিজিৎ স্মরণ গিয়ে বলেছেন :

"দেশবিভাগের কুঠারাঘাত লক্ষ লক্ষ মানুষের মত, আমাদের পরিবারও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। সমস্ত পাঁচের দশক - আমার স্কুলজীবন। দুরন্ত দারিদ্র্যে পার হয়েছে। এবং যাকে আমরা সত্তর দশকের আন্দোলন বলি, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল প্রথম থেকেই। চাকরি এবং ঘর ছেড়ে গ্রামে চলে যাই আমি। এই আন্দোলনে পেশাদার হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম আমি প্রায় প্রথম থেকেই।"[১২]

অভিজিৎ প্রতিকূল নানা পরিস্থিতিতে মানুষের অসহায় জীবনকে দেখেছেন, গ্রামীণ জীবনের প্রতিটি পল অনুলকে পরখ করেছেন। ব্যাঙ্কের কর্মচারী হিসাবে তিনি অপারেশন বর্গা কর্মসূচীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থেকেছেন বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে এবং এই সমস্যাটির সঙ্গেও অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হয়েছেন। জীবনকে ব্যক্তিকভাবে নয়, রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতির বহুমাত্রিকতাকে জড়িয়ে দেখছেন তিনি। তাঁর ছোটগল্পগুলি তাই আমাদের উৎসভূমিটিকে চিনিয়ে দেওয়ার বয়ান। এই বয়ান তিনি নির্মাণ করেন প্রথাগত বয়ানের বিপরীতে। এই বয়ানে তাই আধুনিকতাকে সম্পর্কে সংশয় ও জিজ্ঞাসা থেকে যায়। যুক্তিসর্বস্বতার দৃঢ় রশিতে আমাদের মনকে আমরা বদ্ধ করতে চাই, অথচ আমাদের চতুর্দিকেই মজুত রয়েছে অসংখ্য বিশ্বাস-লৌকিক-অতিলৌকিকের অসংখ্য উপাদান। এই লৌকিকতা ও অলৌকিকতাকে উপেক্ষা না ক'রে তারই সমন্বয়ে গড়ে তাঁর কথাসাহিত্যের প্রতিবেদন। এদেশের পরতে পরতে সঞ্চিত স্পন্দনকে, মানুষের যথার্থ পরিচয়কে, জাতির প্রকৃত ইতিহাসকে তুলে ধরতে গিয়ে লেখক এদেশেরই ইতিহাস-কথকতা-পুরাবৃত্তের দ্বারস্থ হন। তাঁর বিচরণের ক্ষেত্র তাই অধিকাংশ সময়েই লোকায়ত সমাজের ধারার মধ্যে, প্রান্তিকায়িত জনজীবনের মধ্যে। তাদের ইতিহাসকে, পরম্পরাকে তথা লুপ্ত কাহিনিকে উদ্ধার করেছেন অভিজিৎ তাঁর ছোটগল্পে ও উপন্যাসে। ব্যক্তিজীবনে ব্যাঙ্কের কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা যেমন তাঁর আছে, তেমনি তাঁর ছোটগল্পেও একজন ব্যাঙ্ককর্মী গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে পরিচিত, শ্রেণী সমস্যা সম্পর্কে অবহিত। তাই তাঁর গল্পে ভাগ চাষ-আধিজমি তথ্য ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত শ্রেণি সংগ্রাম রূপায়িত হয়।

উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ পটভূমিটি অভিজিতের গল্পে বারবার আসে। বিশেষতঃ বরিন্দ অঞ্চলের মাটিকেও সেই মাটিত লালিত মানুষকে অসাধারণ দক্ষতায় অঙ্কন করেছেন। **উত্তরবঙ্গের আনাই, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, নাগর, কুলিক, মহানন্দা, ফুলহর, কালিন্দ্রী প্রভৃতি নদীবহুল** অঞ্চলকে ও তার চারপাশের মানুষজনকে তিনি চিনিয়ে দিয়েছেন। **উত্তরবঙ্গের উত্তরাংশের তিস্তা, তোর্সা, মনসা, রায়ডাক কিংবা ব্রহ্মপুত্র নদী পরিবৃত পরিমন্ডলকে কিংবা সেই পরিমন্ডলের অংশীদার-মানুষগুলিকে তাদের আচার সংস্কার কৌম বৈশিষ্ট্য সমেত রূপায়িত করেছেন।** অভিজিৎ মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণের বিষয়ে ফ্রয়েডের দ্বারা প্রভাবিত। সম্পর্ক নির্ধারণের অন্যতম নিয়ামক শক্তিরূপে দৈহিক ভূমিকাকে বড় ক'রে দেখেছেন। ভোগের সামগ্রীর কাছে প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতির মতো মানবমনের কোমল দিকগুলি হার মানে। বিশ্বায়নের দাপটে, পণ্যের বাজারে পুষ্পিত পেলব মনের - কোন মূল্য তাই থাকে না। মানুষের নিরন্তর একা হওয়ার কাহিনিকে তিনি পরিবেশন করেন। উত্তর উপনিবেশকালে এক ভিন্ন

প্রতিবেদন রচনায় উৎসাহী অভিজিৎ বাস্তব আর ইন্দ্রজালের সংমিশ্রণে লাতিন আমেরিকার উপন্যাসের ধাঁচে কুহকী জগৎ রচনা করলেও পাঠক তার মধ্যে একটি গল্পকে খুঁজে পায়। ছোটগল্প লিখতে অভিজিৎ ব্যাকরণগত শিল্পসীমানাকে বারবার লঙ্ঘন করেন। তাঁর ছোটগল্পে তাই উপন্যাসের ব্যাপকতা থাকে। তিনি ছোটগল্প শুরু করেন ভাষ্যরচনার মধ্য দিয়ে, ব্যক্তির কাহিনি হারিয়ে যায় কৌম সমাজের কাহিনিতে, গল্প শেষও করেন স্বরন্যাসের মধ্য দিয়ে ভাষ্য, টীকা বৃত্তান্ত, সংবাদ, কথকথা, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এক নতুন বয়ান নির্মাণ করেন লেখক। এক ইতিবাচক জীবনদর্শনকে ছোটগল্পের অন্তিমে উপহার দেন তিনি। দেশভাগজনিত বিষাদ তাঁর গল্পে রয়েছে। দেশভাগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিকার মানুষগুলির শিকড়ের প্রতি টানকে তিনি পরিস্ফুট করেন। সব মিলিয়ে উত্তর উপনিবেশকালের মানুষজনের জিজ্ঞাসাকে অভিজিৎ তাঁর ছোটগল্পে বারবার রেখে যান। আমরা কি এ ব্যর্থ শিক্ষা সংস্কৃতিকেই লালন করলাম! গল্পকার অভিজিৎ তাঁর ছোটগল্পে এই জিজ্ঞাসাকেই রাখেন এবং উত্তরও খোঁজেন আর এর মাঝেই পাঠক, পায় তার প্রকৃত পরিচয়।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১) সাক্ষাৎকার, মোহাঃ আমিরুল ইসলাম, ৬ই আগষ্ট ২০১২, দমদম (ছাতাকল)
২) 'ধানপোকা', 'পঞ্চাশটি গল্প-র অন্তর্গত, অভিজিৎ সেন, সুবর্ণরেখা, কলকাতা ৭০০ ০০৯ প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃষ্ঠা ১৩১
৩) 'নদীর মধ্য শহর', পঞ্চাশটি গল্প-র অন্তর্গত, অভিজিৎ সেন, সুবর্ণরেখা, কলকাতা ৭০০ ০০৯
৪) 'বাখিলা', ঈশাণী মেঘ ও অন্যান্য গল্প-র, অন্তর্গত, অভিজিৎ সেন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, বসন্ত কুঞ্জ, ফেস-২, নয়াদিল্লী, ১১০০৭০, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃষ্ঠা ১১৯
৫) 'রহুচন্ডালের হাড়', অভিজিৎ সেন, জে. এন. চক্রবর্তী এন্ড কোং, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১০, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, পৃষ্ঠা ২৬৮
৬) 'বর্গক্ষেত্র', অভিজিৎ সেন, এক্ষন পত্রিকা, বর্ষা, ১৯৮১, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৮
৭) 'শিশুপাল', 'পঞ্চাশটি গল্প-র অন্তর্গত, অভিজিৎ সেন, সুবর্ণরেখা, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃষ্ঠা ৩৪০
৮) 'শিশুপাল', 'পঞ্চাশটি গল্প-র অন্তর্গত, অভিজিৎ সেন, সুবর্ণরেখা, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃষ্ঠা ৩৪৩
৯) 'শিশুপাল', 'পঞ্চাশটি গল্প-র অন্তর্গত, অভিজিৎ সেন, সুবর্ণরেখা, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃষ্ঠা ৩৪৭
১০) 'বর্গক্ষেত্র', অভিজিৎ সেন, এক্ষন পত্রিকা, বর্ষা, ১৯৮১, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩৬
১১) 'ব্রহ্মণ্য', 'পঞ্চাশটি গল্প-র অন্তর্গত, অভিজিৎ সেন, সুবর্ণরেখা, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃষ্ঠা ২৫৫
১২) 'কেন লিখি কি লিখি, অভিজিৎ সেন, কোরক, শারদীয়, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।